একটি দেশে কী পরিমাণ মুদ্রা ছাপাতে পারবে তা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে একটু টাকার ইতিহাস জানা দরকার।

মানব সভ্যতার শুরুতে মানুষ জিনিসের বিনিময়ে জিনিস লেনদেন করতে। এটাকে Barter system বলা হত। কিন্তু বার্টার করার অসুবিধা হল যদি একজন চাল চায় এবং তার বদলে সে মাছ বেচবে তবে তাকে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে যার কাছে দেয়ার মত চাল আছে এবং সে বদলে মাছ কিনতে ইচ্ছুক। অর্থনীতির ভাষায় এটাকে Coincidence of wants বলে, অর্থাত সবার চাহিদা একে অন্যের সঙ্গে মিশতে হবে। এই লেনদেনর পন্থাটা খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না বলে তারা কোন বিশেষ বস্তুকে মূল্যবান বলে নির্বাচিত করে সব লেনদেন তার নিরিখে করতে লাগলো। যেমন বাংলায় এক সময় কড়ির খুব চল ছিল। এই কড়ির বিনিময়ে জিনিস বেচা কেনা করত লোকে।

নানা প্রকারের কড়ি

তবে এর ও কিছু সমস্যা ছিল। সমস্যা হল কড়ি বিভিন্ন আকারের ও ধরনের হয়। তাহলে এক একটা কড়ির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন।

এই সমস্যার সমাধান করতে রাজারা কোন মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রুপো বা তামা ব্যবহার করতে লাগলো এবং এগুলোর আকার ও ওজন নির্ধারণ করে দেওয়া হল। এই নির্ধারিত ওজন ও আকারের ধাতব জিনিসগুলোকে নাম দেওয়া হল মুদ্রা। রাজারা নিজের প্রভুত্ব প্রজাদের বোঝানোর জন্য তাতে নিজের মুখের প্রতিকৃতি বা কোন রাজ চিহ্ন ব্যবহার করতে লাগলো।

রোমান সম্রাট অরেলিয়াসের প্রতিকৃতি যুক্ত সর্ণ মুদ্রা।

গুপ্ত বংশের তীর ধনুক হাতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও অপর পিঠে মালক্ষ্মীর প্রতিকৃতি।

তবে এই ধরনের মূদ্রার তৈরী করতে সোনা ও রুপোর দরকার পরে যা পাওয়া বেশ কষ্টকর এবং দির্ঘ ব্যবহারে তা ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই Token money র সুচনা হল। এর প্রথম সূচনা করেন দিল্লি সালতানাতের মহম্মদ বিন তুঘলক। তিনি মূল্যবান ধাতুর বদলে কম দামের ধাতু যেমন নিকেল বা তামার মূদ্রা বানালেন। এবং এই মূদ্রাগুলোর মূল্য সর্ণ মুদ্রার সমান ধার্য করা হল। মানে মূদ্রাগুলো token এর মত কাজ করত, কেউ চাইলে তা সর্ণ মুদ্রাতে বদলে ফেলতে পারত বা এগুলো দিয়ে বেচা কেনা করতে পারত। তবে এরও সমস্যা দেখা দিল যেহেতু তামার সোনার চেয়ে কম দাম সাধারণ মানুষ এই টোকেন গুলো নকল করে আসল সোনার মূদ্রাতে বদলে ফেলতে লাগলো। এই নকল না আটকাতে পারায় রাজকোষ দ্রুত খালি হয়ে যেত লাগলো। এই কারণে সুলতানকে আগের ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হল। যদিও এই চিন্তাটা ছিল যুগান্তকারী তার সময়ের জন্য এটা বড্ডো উন্নত ছিল।

তুঘলকের টোকেন মূদ্রার।

বিদেশী বাণিজ্য সোনা ও রুপোতে হত। কিন্তু ভারত ও চিনের থেকে প্রচুর জিনিস আমদানী করার ফলে ইউরোপের রুপোর ভান্ডার প্রায় শেষ হয়ে যায়। তখন ১৭১৭ সালে ব্রিটিশ রয়েল মিন্টের কর্ণধার স্যার আইজ্যাক নিউটন স্টার্লিংয়ের তুলনায় গিনির দাম বাড়িয়ে রুপোর ব্যবহার তুলে দেন। এর ফলে খালি সোনার গিনিই ব্যবহার হতে থাকে।

এরপর ইউরোপের দেশেগুলো ধিরে ধিরে Gold standard চালু হয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় এক ধরনের Promissory note মানুষ ব্যবহার করত। এই নোটগুলো কোন সরকার বা ব্যাঙ্ক ছাড়তে পাড়ত এবং এই প্রত্যেক নোটগুলো তার উপর লেখা সমপরিমাণ সোনা দিয়ে বদলে ফেলা যেত। তাই হিসেব মত যার কাছে যত সোনা থাকবে সে তার সম পরিমাণ নোট ছাপতে পারবে। তাই আগেকার দিনে বেশিরভাগ দেশের টাকার বদলে আপনি নোটে লেখা সম পরিমাণ সোনা ব্যাঙ্ক থেকে বদল করতে পারতেন, এবং আপনি চাইলে ব্রিটিশ পাউন্ড দিয়ে আমেরিকাতেও সোনা বদল করতে পারতেন। তবে ১৯৩১ সালে ব্রিটেন এই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ত্যাগ করে পুরোপুরি। ১৯৭১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ করে দেয়। তবে ১৯৩৩ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ মানুষের জন্য ডলারের বদলে সোনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ডলারে বদলে সোনা নেওয়া যেত। কিন্তু ১৯৭১ সালে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।

একটা ১০০০০ ডলারের গোল্ড সার্টিফিকেট যা টাকার মত ব্যবহার করা যেত। খেয়াল করে দেখবেন এখানে লেখা আছে 10000 dollars in gold।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সমস্যা ছিল। এই ব্যবস্থায় সোনার দাম বেঁধে দেওয়া ছিল এবং সব দেশের Exchange rate একে অন্যের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া ছিল। তার ফলে,

- কোন দেশ চাইলে নিজের ইচ্ছে মত টাকা ছাপতে পাড়ত না। টাকার জোগান সোনার ভান্ডারের সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার ফলে দেশের অর্থনীতিতে চাহিদা অনুযায়ী টাকার যোগান দেওয়া যেত না সব সময়। এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হত।
- এই ব্যবস্থায় দেশের মানুষের বা শিল্পের উৎকর্ষতার সাথে দেশের অর্থনীতির তেমন যোগ ছিল না। যে দেশের যত সোনা তার অর্থনীতি তত মজবুত। তবে কোন দেশ বেশি রপ্তানি করতে পাড়লে তার সর্ণ ভান্ডার বৃদ্ধি পাওয়ার একটা সুযোগ থাকত।
- সবার অর্থনীতি এর ফলে যুক্ত ছিল। কোন দেশের আর্থিক মন্দার প্রভাব অন্য দেশেও পড়ত।
- হুট করে কোন দেশ সোনার কোন বড় ভান্ডার খুঁজে পেলে তাতে অর্থনীতিতে তার প্রভাব পরে সব ঘেঁটে যেত। তাই ঠিক করতে সময় লাগত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশিরভাগ দেশ আমদানি ও রপ্তানি বন্ধ করে দেয় এর ফলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যথেষ্ট ধাক্কা খায়। তার পর বিশ্ব জোড়া আর্থিক মন্দা আসে তখন টাকা বদলে সোনা নেওয়ার হিড়িক পড়ে যায় কারণ সরকারের উপর মানুষের আস্থা উঠে যাচ্ছিল তাই রাতারাতি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সব দেশ থেকে উঠে যায়।

এখন সব দেশ Fiat money চলে। এর মূল্য সেই দেশের সরকার নির্ধারণ করে এবং বাজারও কিছুটা নির্ধারণ করে। এর কোন গ্যারান্টি নেই সরকারই এর গ্যারান্টি দেয়। তাই টাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলে

> I promise to pay the bearer...
>
> (আমি এই নোটের অধিকারীকে ... টাকার অঙ্ক দেওয়ার আস্বাস দিচ্ছি।)

এখানে কেবল মাত্র আস্বাসের উপর সব চলছে।

এই কারণে কোন দেশ কত টাকা ছাপাতে পারবে তা নির্ধারণ করে সেই দেশের অর্থনীতির উপর মানুষের কতটা আস্থা আছে।

সাধারণ ভাবে টাকা
অনুযায়ী অন্যান্য
মুদ্রাস্ফীতি দেখা দে

মোটামুটিভাবে বাজেটে ঘাটতি ধরে চলে। এই ঘাটতি পূরণ করার সবচেয়ে ভালো উপায় নয় টাকা ছাপানো নয় ঋণ নেওয়া। আগে বলেছি বেশি টাকা ছাপালে মুদ্রাস্ফীতি হয় তাই বেশিরভাগ সরকার ঋণ নেয়। এই ঋণগুলো দুভাবে সোধ করা যায়।

- ঋণের টাকায় রাস্তাঘাট, বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ইত্যাদি পরিকাঠামো বানানো যাতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য বাড়ে। এর ফলে কড় আদায় বাড়বে এবং সরকারের আয় বাড়বে। এই বাড়তি আয় দিয়ে দিয়ে ঋণ সোধ হবে।
- অন্য উপায় হল ঋণের টাকায় সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়া। দেশের নাগরিকদের বিশেষ ভাতা দেওয়া ও তাদের বসে বসে খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা পরবর্তী নির্বাচনে সরকারকে আবার ভোট দেয়। ঋণের কিস্তি সোধ সরকার আরো টাকা ছাপিয়ে করে ফেলতে পারবে। তাতে অল্প বিস্তর মুদ্রাস্ফীতি হবে কিন্তু তার জন্য না হয় সরকার আরো ভাতা দিয়ে দেবে।

এবার বুঝতেই পারছেন কোন পদ্ধতিটা বেশিরভাগ সরকারের পছন্দ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ঋণের পরিমাণ জুন, ২০১৯ ছিল ২২ লাখ কোটি ডলার। সেখানে মার্কিন GDP ২০১৯ ২১ লাখ কোটি ডলার। মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ঋণ তার দেশের মোট আয়ের বেশি। ঋণের কিস্তি সোধ দেওয়ার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরো ডলার ছাপিয়ে দেয়।

আপনি বলতে পারেন বাহ্ বেশ ভালো উপায় তো। টাকা ছাপাও আর ঋণ সোধ কর। শুনতে সহজ মনে হলেও ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। আগে বলেছি টাকার উপর মানুষের ভরসাটাই আসল। মানুষ মার্কিন অর্থনীতির উপর ভরসা করে এবং তাকে সহজে ঋণ দেয়। এই ঋণ সোধ করতে তারা ডলার ছাপালেও বিশ্ব বাণিজ্যে ডলারের বিপুল চাহিদার কারণে সেই অনুপাতে ডলারে ক্রয় ক্ষমতা কমে না। মানে বিশ্ব বাণিজ্যে ডলারের চাহিদা অনুযায়ী ডলারের যোগান কম এই কারণে ডলার বেশি ছাপালেও মার্কিন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি হবে না তেমন ভাবে। বাড়তি ডলার বিশ্ব বাণিজ্যের যোগান দিতে বেড়িয়ে যাবে।

যেহেতু দিন দিন বিশ্ব বাণিজ্য বাড়বে ডলারের চাহিদাও বাড়বে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা মত ঋণ নেয় এবং তার কিস্তি দেওয়ার সময় এলে ডলার ছাপিয়ে সোধ করে। তবে বিশ্ব জোরা আর্থিক মন্দার কারণে বিশ্ব বাণিজ্য ধাক্কা খেয়েছে এর ফলে ডলারের চাহিদা যতটা প্রত্যাশিত ছিল তার চেয়ে কম বেড়েছে। এই কারণে এই পন্থায় ডলার ছাপাতে মুশকিল হচ্ছে। যেকারণে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ঋণ সোধ করতে পারবে না। এমন হলে বিশ্ব অর্থনীতিতে কী ভীষণ প্রভাব পরবে তা বলে বোঝানো যাবে না।

তাই যদি আপনার দেশের অর্থনীতির উপর মানুষের ভরসা থাকে এবং আপনার টাকা বিশ্ব বাণিজ্য প্রচুর ব্যবহৃত হয় তবে আপনি বলতে গেলে ইচ্ছা মত টাকা ছাপাতে পাড়েন।

তা না হলে, বিনা আর্থিক বৃদ্ধিতে ইচ্ছা মত টাকা ছাপালে আপনার দেশের অবস্থা ভেনেজুয়েলা বা জিম্বাবুয়ের মত হবে। তখন দেশের মানুষেই আর আপনার টাকা ব্যবহার করবে না তার বদলে ডলার বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করবে।

?????? ?????

কিছুদিন আগে "লা কাসা দে পাপেল" নামে স্প্যানিশ একটা টিভি সিরিজ বেশ শোরগোল তুলেছিল। এতে দেখে যায়, একদল ডাকাত একটা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে ঢুকে কিছু মানুষকে জিম্মি করে টাকা লুট করছে। তবে তাদের লুট করার পদ্ধতি একটু ভিন্ন। তারা ব্যাংকের টাকা লুট
নিচ্ছে বিলিয়ন বিলি

এটা দেখার পর কারও কি এ প্রশ্ন মাথায় এসেছে, যে তাদের মত সরকার নিজেই যদি বিলিয়ন-বিলিয়ন টাকা প্রিন্ট করে আমাদের হাতে তুলে দেয়, তাহলেই তো সব আর্থিক সমস্যা মিটে যায়! কিংবা, সরকার যদি বস্তা বস্তা টাকা প্রিন্ট করে পদ্মা সেতু, মেঘনা সেতু, বুড়িগঙ্গা সেতু তৈরী করে, তাহলেই বা সমস্যা কোথায়?

অনেক সমস্যা রে ভাই, অনেক সমস্যা। এত বড় সমস্যার এত সহজ সমাধান হলে দুনিয়ায় আর কোন চিন্তাই থাকত না। সমস্যাটা কোথায়, বলি।

নির্দিষ্ট করে বললে টাকা প্রিন্ট করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তো, সে কীসের ভিত্তিতে টাকা তৈরী করে? সে কি মন চাইলেই যত ইচ্ছা টাকা প্রিন্ট করতে পারে?

টাকা উৎপাদন করার কোন আবশ্যক নিয়ম নেই। কোন দেশের সরকারের যত ইচ্ছে টাকা প্রিন্ট করার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে কোন দেশই যত ইচ্ছা টাকা প্রিন্ট করে না, টাকা প্রিন্ট করা হয় সেই দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে তার সাথে ভারসাম্য রেখে। টাকা উৎপাদনের পরিমাণের সাথে জড়িত দেশের মানুষের উপার্জন, অর্থনৈতিক চাহিদা, দেশের সম্পদ ইত্যাদি। এর বেশি উৎপাদন করলেই শুরু হয় সমস্যা, দেশের অর্থনীতি ভারসাম্য হারাতে শুরু করে।

ধরুন, একটা দেশে সম্পদ বলতে রয়েছে দশটা আম (কী ধরা যায় ভাবতে গিয়ে আমের কথাই মাথায় এল সবার প্রথমে, সম্ভবত মৌসুমী প্রভাব)। আর সেই দেশ বছরে ২০ টাকা প্রিন্ট করে। পরিবহন খরচ, খুচরা মূল্য পাইকারী মূল্য ইত্যাদি জটিলতা বাদ দিয়ে ধরেই নিই প্রতিটি আমের মূল্য ২ টাকা। তাহলে দেশের মোট সম্পদ আর মোট কারেন্সী (Currency) ভারসাম্যপূর্ণ হল। পরের বছর ঐ দেশটি সর্বমোট ৪০ টাকা প্রিন্ট করল, কিন্তু মোট সম্পদ বলতে দশটি আমই রইল। যেহেতু দেশে নতুন কোন সম্পদ নেই, ওই ১০টি আম কেনার জন্য বরাদ্দ হল ৪০টাকা, অর্থাৎ প্রতিটি আমের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেল। এভাবেই দেশের মোট সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত টাকা উৎপাদন করলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, টাকার দাম বা ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। একে বলে মূদ্রাস্ফীতি।

দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে বেশি করে টাকা ছাপিয়ে আর লাভ কি হল? তাই একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রীতিমত গবেষণা করে চাহিদা নির্ধারণ করতে হয়, সেই অনুযায়ী টাকা প্রিন্ট করতে হয়। সাধারণত একটি দেশের জিডিপির ২-৩ শতাংশ টাকা প্রিন্ট করা হয়, তবে উন্নয়নশীল দেশে এই হার আরেকটু বেশি।

এই কারণেই আমরা ইচ্ছামত টাকা তৈরী করে রাতারাতি পদ্মা সেতু বানিয়ে ফেলতে পারি না। তাহলে সেই বাড়তি টাকা শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডিলার, সাপ্লায়ার এবং আরও অনেকের হাত ধরে প্রবেশ করবে মূলধারার অর্থনীতিতে, এবং এর বারোটা বাজিয়ে দেবে।

মূদ্রাস্ফীতির কারণে বাড়তি অর্থ কাটাকাটি হয়ে যায় কেবল তা-ই না, এর ফলে দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কীভাবে হয় সেটা বলি।

- সঞ্চয়ের মূল্য কমে যাবে। আজকে ১০ টাকা দিয়ে চিপস না কিনে সেটা ব্যাংকে রাখলাম। এখন যদি দুইদিন পরে দেখি একটা চিপসের দাম ২০ টাকা, তাহলে তো সঞ্চয় ব্যাপারটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা হল!
- আমরা অনেকেই বন্ড কিনেছি বা কাউকে বন্ড কিনতে দেখেছি। এই বন্ডের মাধ্যমে আসলে সরকার আমাদের কাছে অর্থ ধার করে। আজকে পঞ্চাশ টাকার বন্ড বিক্রি করে সেই অর্থ কাজে লাগিয়ে এক বছর পরে সরকার আমাকে পঞ্চাশ টাকা ফেরত দিচ্ছে, ব্যাপার
  কিনলাম, এক
  পঞ্চাশ টাকায়

- টাকার ক্রয়ক্ষমতার অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। ব্যাবসাখাতে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে।
- যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হবে, সে দেশের মুদ্রার দাম অন্যদেশের মুদ্রার তুলনায় কমে যাবে। ধরুন, জার্মানীতে মুদ্রাস্ফীতির হার দিনে ২০%, আর ভারতে ০%। অর্থাৎ ১০০ টাকার একটি দ্রব্যের মূল্য কাল জার্মানীতে হবে ১২০ টাকা, ভারতে ১০০ টাকাই থাকবে। সেক্ষেত্রে ভারতের এক রুপির মূল্য হবে জার্মানীর ১.২০ মার্কের (জার্মানীর মুদ্রা) সমান।

জিম্বাবুয়ের অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির কথা আমরা জানি। সেখানে এক প্যাকেট পাউরুটি কেনার জন্য এক বস্তা টাকা নিয়ে দোকানে যেতে হত, এমন কথা প্রচলিত আছে। কথাটা খুব একটা ভুলও নয়, বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন জিম্বাবুইয়ান ডলার সেখানে ডালভাত।

এই অস্বাভাবিকতা শুরু মূলত ২০০৮ সাল থেকে। ষাটের দশক থেকেই জিম্বাবুয়ের অর্থনীতির নাজেহাল অবস্থা। একুশ শতকে এসে তা একেবারে চরম আকার ধারণ করে। অর্থনীতি সামাল দিতে মুগাবে সরকার প্রচুর পরিমাণে টাকা প্রিন্ট করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত উলটো ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় জিম্বাবুয়ের অর্থনীতিকে। প্রচুর পরিমাণে টাকা ছাপা হওয়ায় হু-হু করে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে। বর্তমানে জিম্বাবুয়ের মুদ্রাস্ফীতির হার দৈনিক ৯৮%, অর্থাৎ আজকে যার মূল্য ১০০ টাকা, আগামীকাল তা ১৯৮ টাকা দিয়ে কিনতে হবে! চিন্তা করা যায়! তবে মুদ্রাস্ফীতির সর্বোচ্চ হার কিন্তু এটা নয়। এই অপ্রীতিকর রেকর্ড হাঙ্গেরীর, ১৯৪৬ সালে সে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার দৈনিক ১৯৫% পর্যন্ত উঠেছিল।

লিখতে লিখতে ভাবছিলাম, টাকা ছাপিয়ে সেটা দিয়ে বৈদেশিক ঋণ শোধ করা হলে সমস্যা কী? সেক্ষেত্রে তো টাকাটা বিদেশেই চলে যাচ্ছে, আমাদের দেশে তো প্রবেশ করছে না!

আমার ভাবনায় মজার একটা ভুল ছিল। আমি অতিরিক্ত ছাপা হওয়া টাকা দিয়ে যে দেশের ঋণই শোধ করি, যে দেশেই তা খরচ করি, তা ঘুরেফিরে আমার নিজের দেশেই ফেরত আসবে। কারণ আমার দেশের মুদ্রা তো শেষতক আমার দেশের মানুষকেই গ্রহণ করতে হচ্ছে, অন্যান্য দেশে তো আমি এই মুদ্রা দিয়ে কেনাকাটা করতে পারছি না! সুতরাং বাড়তি টাকাটা ঘুরেফিরে আমার দেশের অর্থনীতিতেই প্রবেশ করছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই টাকা কিন্তু আমি সরাসরি বৈদেশিক ঋণ শোধ করায় ব্যবহার করতে পারছি না, কারণ ঋণের চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট কারেন্সীতে তা শোধ করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকে।

একটা দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন করতে বেশি করে টাকা তৈরী করা কোন সমাধান নয়, সমাধান হল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এর ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। উল্টোভাবে উন্নয়ন করতে গেলে উন্নয়নও উল্টোভাবেই হবে!

????? ???? ?????????
??????? ??????
???????,????????